অষ্টম অধ্যায়
নারীবাদী তত্ত্ব
(Feminist Theory)

নারীচেতনা পৃথিবীকে পাল্টে দিয়েছে। মানুষের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসের একটি প্রধান ভিত নারীচেতনার মন্ত্র। যারা এর গুরুত্ব কমিয়ে দেখেন, তারা অর্ধেক জনতার ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন। সত্তর দশকের পর থেকে নারীবাদের প্রভাবে সারা পৃথিবীতেই নারী, পুরুষ ও সমাজ সম্বন্ধে প্রচলিত তত্ত্ব ও ধারণাগুলির আমূল পরিবর্তন হতে থাকে। নারী আন্দোলন ও নারীবাদী তত্ত্বের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতত্ত্বের আঙিনাতেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। নারীর দৃষ্টিকোণকে গুরুত্ব দিয়ে মূলস্রোতের সমাজতত্ত্বে বহুদিন পর্যন্ত গুরুত্ব না পাওয়া বিষয়গুলির বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে এবং ক্রমশ নারীবাদী সমাজতত্ত্বের একটি স্বতন্ত্র ঘরানা সমাজতত্ত্বের তত্ত্ববিশ্বে জায়গা করে নিয়েছে।

নারীবাদ প্রথমে মার্কিন ও ইয়োরোপীয় সমাজে ও পরে পশ্চিমী শিক্ষার সংস্পর্শে আসা সারা পৃথিবীতেই নানাধরণের পরিবর্তন ঘটায়। বিশেষত, গৃহস্থালির অন্দরমহলে নারী-পুরুষের সম্পর্ককেন্দ্রিক ব্যক্তিগত বা 'প্রাইভেট' বলে চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলির বিশ্লেষণ শুরু হয় নতুন দৃষ্টিকোণে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপীয় সমাজের 'পাবলিক ডোমেইন' বা বহির্মহলের পেশাগত জগতে নারীদের অংশগ্রহণ নতুনভাবে নারীর সামাজিক ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করতে শুরু করে। নির্ভরশীল গৃহিণীরা শিক্ষিত, স্বনির্ভর, সচেতন ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষের সমকক্ষতার দাবীদার হয়ে ওঠেন। এই সামাজিক পরিবর্তনে এবং সামগ্রিকভাবে লিঙ্গসাম্যের সমর্থনে দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারীবাদী লেখক, তাত্ত্বিক ও আন্দোলনকারীদের অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

নারীবাদী বিশ্লেষণের সূত্রপাতের আগে যে পটভূমিতে তার উদ্ভব ও যার বিরুদ্ধে তার চ্যালেঞ্জ সেই পিতৃতন্ত্র সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলা দরকার। লিঙ্গ

Scanned with CamScanner

শোষণের পেছনে অনিবার্যভাবেই কর্তৃত্ব ও বশ্যতার ক্ষমতা কাঠামো কাজ করে, সেই রাজনৈতিক ক্ষমতাকাঠামোকে কেট মিলেট পিতৃতন্ত্র বলে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে 'পিতৃতন্ত্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কারণ রাজনীতি শব্দটি সেই সমস্ত ক্ষমতাকেন্দ্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই ব্যবহারযোগ্য, যেখানে একদল লোক আরেকদলকে নিয়ন্ত্রণ করার বন্দোবস্ত তৈরি করে। অন্তঃপুরের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যে পুরুষ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, নারীবাদী দৃষ্টিকোণে তা ব্যক্তিগত নয়, বরং রাজনৈতিক এবং এই প্রত্যয় থেকেই বিখ্যাত নারীবাদী স্লোগানটির জন্ম- "পারসোনাল ইজ পলিটিক্যাল' অর্থাৎ যা ব্যক্তিগত তাও রাজনৈতিক। মিলেটের মতে, লিঙ্গাশ্রয়ী রাজনীতি হলো সেই প্রক্রিয়া যা দিয়ে শাসকলিঙ্গ অধীনলিঙ্গের ওপর ক্ষমতাবিস্তার বজায় রাখে এবং পাঠ্যের নির্মাণেও সেই একই লিঙ্গাশ্রয়ী রাজনীতি সক্রিয় থাকে।

নারীবাদ একটি সামাজিক আদর্শ ও আন্দোলন যা লিঙ্গসাম্যে আস্থাশীল এবং লিঙ্গবৈষম্যবাদী প্রাধান্য-বশ্যতার পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙে লিঙ্গসাম্য ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দায়বদ্ধ এবং যা নারীর দৈহিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, যৌনতা-কেন্দ্রিক, ক্ষমতাকেন্দ্রিক আত্মপ্রতিষ্ঠার এক সচেতন, সম্মিলিত প্রয়াস। নারীবাদ কোন একক, একচ্ছত্র মত নয়, বরং নানামতের সম্মিলিত শক্তিতেই এর উদ্ভব ও বিকাশ। ইউরো-আমেরিকান সমাজের নারী আন্দোলনে এর আনুষ্ঠানিক বিকাশ হলেও, অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মতো এই উপমহাদেশেও নারীশক্তির একক ও সম্মিলিত সচেতন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নারীবাদের ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছে। পশ্চিমের শ্বেতাঙ্গ নারীবাদ বিকশিত হয় প্রথমে মেরি উলস্টোনক্র্যফট, সি রাইট মিলস, ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস, কার্ল মার্কস, সিমোন দ্য বোভোয়ার রচনায়; ১৮৪৮-এর সেনেকা ফলস কনভেনশন ও পরবর্তী নারী আন্দোলনে এবং পরে কেট মিলেট, বেটি ফ্রেডান, জার্মেইন গ্রিয়ারদের অগ্নিগর্ভ লেখায়।

এই ইতিহাস জানার পাশাপাশি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মেয়েদের এই সব প্রতিবাদ ও আন্দোলনকে বৃহত্তর সমাজ কখনই ভালোভাবে নেয় নি, বরং শ্লেষ, ব্যঙ্গ, উপহাস, উদাসীনতার অস্ত্রে যখন এই আন্দোলনকে থামানো যায় নি, তখন মেয়েদের ওপর হিংস্রতার প্রয়োগ শুরু হয়েছে ঘরের ভেতরে এবং বাইরে। একদিকে যেমন মেয়েদের ভোটাধিকারের মিছিলে গুলি চালিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ, অন্যদিকে ঘরের মধ্যে স্বামীরা অবাধ্য, শাসন না

মানা স্ত্রীদের পদানত করতে নিষ্ঠুরতা ও শারীরিক নিগ্রহের পথ নিয়েছেন বারবার, সারা পৃথিবীতেই। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেই লুকিয়ে থেকেছে মানবতার সবচেয়ে বড় অসাম্য ও নিগ্রহ আর সেই উপলব্ধি থেকে এই অসম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমশ আরও জোরালো হয়ে উঠেছে মেয়েদের মুক্তির আন্দোলন। 'নারীবাদ' শব্দটি ঘিরে যে ব্যঙ্গ ও বিভ্রান্তি দীর্ঘদিনধরে জমে উঠেছে, তার ফলে অনেকেই বিকল্প শব্দের খোঁজ করেছেন, বর্ণ-নারীবাদীরা তাদের আন্দোলনকে 'ফেমিনিজম'-এর বদলে 'উয়োম্যানিজম' বলে বর্ণনা করতে পছন্দ করেন, কারণ এই ভিন্ন শব্দের মধ্য দিয়ে শ্বেতাঙ্গ নারীবাদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য করা সহজ হয়। বাংলাতেও নারীবাদের সমনাম হিসেবে 'মানবী চেতনা' শব্দটির ব্যবহার হচ্ছে।

নারীবাদের নানা পর্ব ও প্রকার

ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা নানা মতের এক সম্মিলিত শক্তি নারীবাদ, যা নারীকে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষের অধীনে বিশেষভাবে পদানত একটি সামাজিক গোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করে, এবং সেই অবস্থার অবসান করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই মানবী চেতনার প্রথম লিখিত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ১৭০০ সালে মারি আস্টেলের 'সাম রিফ্লেকশনস আপন ম্যারেজ' শীর্ষক একটি লেখায়। তবে নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম সংগঠিত প্রকাশ হয়েছিল ১৮৪০ সালে আমেরিকা ও ব্রিটেনের পার্লামেন্টে মেয়েদের ভোটাধিকারের দাবী পেশ করা এবং আইনের মাধ্যমে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। মেয়েদের ভোটাধিকারের রক্তাক্ত লড়াই বহুদিন চলার পর অবশেষে ১৯১৮ সালে ব্রিটেনে এবং ১৯২০তে আমেরিকায় বহুপ্রতিক্ষিত সেই নাগরিক অধিকার তারা অর্জন করে। পরবর্তী তিন দশকে ইউরোপ ও আমেরিকায় নারীবাদী আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত অবস্থায় থাকলেও, সত্তর দশকের মেয়েদের উত্তাল, বিদ্রোহী, উদ্দীপক লেখালিখির জোয়ারে প্রথমে পশ্চিমে এবং পরে সারা পৃথিবীতেই শুরু হয় বিপুল শক্তি ও বৈচিত্রে ভরা নারীবাদী আন্দোলনের এক আগুনঝরা পর্ব।

নারীচেতনার তিন তরঙ্গ

পশ্চিমী নারীবাদের সক্রিয় আন্দোলন ও তাত্ত্বিক বিকাশের ধারাকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়,-ফার্স্ট ওয়েভ বা প্রথম তরঙ্গ, সেকেন্ড ওয়েভ বা দ্বিতীয় তরঙ্গ এবং সাম্প্রতিক বা তৃতীয় তরঙ্গ। কিন্তু প্রথম তরঙ্গর আনুষ্ঠানিকতার

Scanned with CamScanner

অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল মেয়েদের সক্রিয়, লিখিত প্রতিবাদের ইতিহাস। শুধু ইউরোপ আমেরিকায়ই নয়, ভারতে এমনকি বাংলাতেও উন্মেষ ঘটেছিল সেই মানবীচেতনার, যার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে আঠের ও উনিশ শতকের বেশ কিছু দিশারী নারীর রচনায়। ১৭০০ সালে মারি আস্টেলের 'সাম রিফ্লেকশনস আপন ম্যারেজ' এবং ১৭৭৬ সালে অ্যাবিগিল অ্যাডামসের স্বামীর প্রতি লেখা একটি ঐতিহাসিক চিঠি মেয়েদের অধিকার চাওয়ার ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে। অ্যাবিগিল অ্যাডামসের স্বামী ছিলেন আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্ট এবং সেইসময়ের এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা।

নারীবাদের প্রথম ঐতিহাসিক বই মেরি উলস্টোনক্র্যাফটের লেখা 'এ ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইটস অফ উইমেন' প্রকাশিত হয় ১৭৯২ সালে। তিনিই প্রথম নারী যিনি লিখলেন যে, রুশো থেকে শুরু করে সব পুরুষ লেখকরাই মেয়েদের শিক্ষা বলতে বুঝিয়েছেন তাদের আরও কৃত্রিম, দুর্বলচরিত্র, পুরুষের মনোলোভন করে তোলা, যা ক্রমশ তাদের সমাজের অপ্রয়োজনীয় সদস্যে পরিণত করে। পুরুষের মনোরঞ্জনের উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তোলার মধ্যে নারীজাতির অপমান লুকিয়ে আছে, কারণ তার অর্থ তারা পুরুষেব. চেয়ে নিকৃষ্ট। তিনিই প্রথম স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেন, 'আমি পুরুষকে ভালবাসি আমার সহযোগী হিসেবে, কিন্তু তার শাসনদন্ড, বৈধ হোক বা অবৈধ, তা কখনই আমার প্রতি প্রসারিত হতে পারে না।'

মারি আস্টেলের 'সাম রিফ্লেকশনস আপন ম্যারেজ' বা অ্যাবিগিল অ্যাডামসের স্বামীর প্রতি লেখা চিঠিটি যেমন মেয়েদের অধিকার চাওয়ার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তেমনই উল্লেখযোগ্য ১৮৬২ সালে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত স্ত্রীলোকের পরাধীনতা বিষয়ক বামাসুন্দরীর চিঠি বা ১৮৭৬ সালে লেখা রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা 'আমার জীবন'। ১৮৮০ সালে মারাঠি মহিলারা নিজেদের পৃথক সংগঠন তৈরী করে স্ত্রীশিক্ষা ও নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা প্রসারের কাজ শুরু করেন এবং ১৮৮২ সালে নারী সম্বন্ধে পুরুষের হীন ধারণা ও অসম ব্যবহারের লিখিত প্রতিবাদ করেন কান্তিবাই কানিতকার। শিক্ষা ও চেতনায় পশ্চিমের তুলনায় ভারতীয় মেয়েরা যে প্রায় এক শতাব্দী পিছিয়ে ছিলেন, তার কারণ ভারতীয় পুরুষদের কানে ইয়োরোপীয় উদারবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও সাম্যের মন্ত্র অনেক দেরীতে পৌঁছেছিল।

নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ

প্রথম তরঙ্গের নারীবাদ ১৮৪৮-এর সেনেকা ফলস কনভেনশনে শুরু হয়ে বিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। প্রথম তরঙ্গের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৭৬ সালে অ্যাবিগিল অ্যাডামসের অগ্নিগর্ভ চিঠি এবং ১৭৯২ সালে মেরি উলস্টোনক্রাফট'র যুগান্তকারী বই 'এ ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইটস অফ উইমেন'। এরাই ছিলেন নারী আন্দোলনের পূর্বজননী। প্রথম তরঙ্গের নারী আন্দোলন প্রচলিত সামাজিক কাঠামোকে বজায় রেখে মেয়েদের আইনি ও রাজনৈতিক সমানাধিকার অর্জন ও প্রকাশ্য পেশায় বেশিমাত্রায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে আন্দোলন ও যুক্তি উপস্থাপন করেছিল। একদিকে যখন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগ্রামী ও স্বাধীনচেতা মেয়েরা পৃথিবীর অর্ধেক জনতার এতদিনের না বলা কথাগুলি ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল তখন অন্যদিকে নারীর এই নতুন ভাষার প্রভাবে যুগসন্ধিক্ষণের কোন কোন পুরুষ নতুন করে ভাবতে শুরু করেছিলেন নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও নারীর আর্থ-সামাজিক ভূমিকা নিয়ে। উনিশ শতকের শেষার্ধে প্রকাশিত হয় এমন তিন যুগপুরুষের তিনটি দুনিয়া কাঁপানো রচনা, জন স্টুয়ার্ট মিলের 'দি সাবজেকশন অফ উইমেন' (১৮৬৯), হেনরিক ইবসেনের বৈপ্লবিক নাটক 'এ ডলস হাউস' (১৮৭৯) এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের 'দি ওরিজিন অফ দি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দি স্টেট' (১৮৮৪)। উনিশ শতকের শুরু থেকেই প্রথম তরঙ্গের নারীবাদী লেখকরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন, ক্রমশ প্রকাশিত হয় অলিভ শ্রাইনারের 'উয়োম্যান অ্যান্ড লেবার' (১৯১১), রেবেকা ওয়েস্টের 'দি লাইফ অফ এমিলি ডাভিসন' ও 'মি চেস্টারটন ইন হিস্টেরিকস' (১৯১৩), ভার্জিনিয়া উলফের বিখ্যাত বই 'আ রুম অফ ওয়ান'স ওন' (১৯২৯) এবং নারীচেতনার আকরগ্রন্থ সিমোন দ্য বোভোয়ার 'দি সেকেন্ড সেক্স' (১৯৪৯)।

সেনেকা ফলস কনভেনশন ঘোষণাপত্র

নারীবাদের ইতিহাসে ১৮৪৮ সালের সেনেকা ফলস কনভেনশনের ঘোষণাপত্রটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এলিজাবেথ ক্যানডি স্ট্যানটনের উদ্যোগে নিউ ইয়র্কের সেনেকা ফলসের একটি গির্জায় ১৮৪৮ সালের ১৯শে জুলাই মহিলাদের অধিকার বিষয়ে এই ঐতিহাসিক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন লুক্রেশিয়া মট, যিনি দাসত্ব বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। এর আট বছর

Scanned with CamScanner

আগে লন্ডনের এক দাসত্ব বিরোধী সমাবেশে এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যানটন ও লুক্রেশিয়া মট লক্ষ্য করেন যে কোন নারীকেই ঐ সমাবেশে ডেলিগেটের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। পরে স্ট্যানটন লেখেন, ঐ মানবাধিকার সমাবেশে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো লিঙ্গবৈষম্য বহু নারীকে সচকিত করে তোলে এবং নতুন আন্দোলনের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। আট বছর পরে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতায় যখন তাদের বঞ্চনাবোধ আরও তীব্র হয়ে ওঠে, তখন আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আদলে মট ও স্ট্যানটন 'সেনেকা ফলস হৃদয়াবেগ ও প্রস্তাবনার ঘোষণাপত্র' তৈরী করে এবং নারী অধিকার সংক্রান্ত সমাবেশের ডাক দেন। সময়টা খুবই উপযুক্ত ছিল এই কারণে যে তখন ইংল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রিয়া এবং অন্যত্র সারা পৃথিবী জুড়েই শ্রমিক আন্দোলনে, উদার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মানুষ পথে নামছিল। ঐ ১৮৪৮ সালেই প্রকাশিত হয় মার্কস ও এঙ্গেলসের দুনিয়া কাঁপানো মহাগ্রন্থ 'দি কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো'। সেনেকা ফলস অধিবেশনে জড়ো হয়েছিলেন প্রায় একশো নারী ও পুরুষ। নারীর অধিকার রক্ষার ১২টি প্রস্তাবের মধ্যে ১১টি সর্বসম্মতিতে এবং ১টি, নারীর ভোটাধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবটি, ভোটাভুটিতে গৃহীত হয়।

জন স্টুয়ার্ট মিলঃ দি সাবজেকশন অফ উইমেন (১৮৬৯)

মিলের এই রচনাটি পশ্চিমী চিন্তাজগতে এবং নারীমুক্তির ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী আলোড়ন ফেলেছিল। তাঁর এই লেখার পেছনে ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু ও পরে স্ত্রী হ্যারিয়েট টেইলরের নারীবাদী মতামতের প্রভাব। মিল লক্ষ্য করেন যে সমাজে নারীর অবস্থান পুরুষের অধীন সেবাদাসীর। নারীর কাছে পুরুষ নিছক আনুগত্য চায় না, চায় তাদের নিঃশর্ত হৃদয়াবেগ। 'সব পুরুষই, একান্ত ক্রুর না হলে, নারীকে চায় স্বেচ্ছাদাসী রূপে, বলপ্রয়োগে দাস বানাতে চায় না, নিছক ক্রীতদাস নয়, বরং চায় প্রিয় সেবিকা রূপে। ফলে, তারা মেয়েদের মনকে বশ মানানোর জন্য সবরকম উপায় ব্যবহার করে। মেয়েদের ছোট থেকেই শেখানো হয় যে তাদের ইচ্ছা ও কাজের কোন স্বাধীনতা নেই, পুরুষ প্রভুর অঙ্গুলিহেলনে চলাই তাদের কর্তব্য। তাঁর মতে প্রচলিত ব্যবস্থায় পরিবার মানে স্বৈরাচারের পাঠশালা, এবং বিবাহের মধ্যে প্রচলিত দাসত্বের নিয়ম আধুনিক সমাজের উদার নীতিগুলির সঙ্গে দানবীয় বৈপরীত্য তৈরী করে।

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ঃ দি ওরিজিন অফ দি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দি স্টেট (১৮৮৪)

এই বইতে এঙ্গেলস লেখেন যে, নারীর ওপর শোষণের মূলে দুটি ঘটনা কাজ করে, সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানা ও সামাজিক উৎপাদন থেকে মেয়েদের নির্বাসন। এই দুই ঘটনার ধাক্কায় মেয়েদের যে বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয় ঘটেছে তার ফলে তারা ক্রমশ পরিবারের দাসীর পর্যায়ে নেমে এসেছে, পুরুষের আকাঙ্ক্ষার বাঁদি ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। পুরুষের এই একচ্ছত্র ক্ষমতার ভিত্তিতে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার তৈরি হয়। একবিবাহের নিয়ম তৈরি করে মেয়েদের বেঁধে রাখা হয় মূলত পুরুষের পিতৃত্ব নিশ্চিত করতে ও সম্পত্তির পুরুষানুক্রম তৈরি করতে। এঙ্গেলস বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ হলে তার ভিত্তিতে পুরুষের প্রাধান্যও বিলুপ্ত হবে।

সিমোন দ্য বোভোয়া ঃ দি সেকেন্ড সেক্স (১৯৪৯)

সিমোন দ্য বোভোয়ার 'দি সেকেন্ড সেক্স'কে নারীবাদী চেতনার ধর্মগ্রন্থ বলা যায়। তিনি বলেন, নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, প্রতিপদে তাকে মেয়েলি বানিয়ে তোলা হয়। মেয়েদের মেয়েলি ও পুরুষকে পুরুষালি করে তোলা এক কৃত্রিম সামাজিক নির্মাণ, যা নারীপুরুষের জৈব পার্থক্যকে কেন্দ্র করে সামাজিক পার্থক্যের পাহাড় বানায়। বোভোয়ার মতামতের ওপর ভিত্তি করেই সত্তর দশকের নারীবাদী তত্ত্বের বিকাশ হয়েছে।

নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ

দ্বিতীয় তরঙ্গের সূত্রপাত হয় বেটি ফ্রেডানের 'দি ফেমিনাইন মিস্টিক' (১৯৬৩), জুলিয়েট মিচেলের 'উইমেন : দি লঙ্গেস্ট রেভোলিউশন' (১৯৬৬) এবং সত্তরের দশকের তিনটি নারীবাদী আকরগ্রন্থ, কেট মিলেটের 'সেক্সুয়াল পলিটিক্স' (১৯৭০), জার্মেইন গ্রিয়ারের 'দি ফিমেল ইউনাক' (১৯৭০) ও অ্যাড্রিয়েন রিচের 'হোয়েন উই ডেড অ্যাওকেন' (১৯৭১) প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এছাড়াও শুলাস্মিথ ফায়ারস্টোন, অ্যানড্রেয়া ডোয়ারকিন, সুসান ব্রাউনমিলার, সুসার গ্রিফিথের লেখা এই পর্বের ভিত তৈরী করে। ১৯৭০-এই ক্যারল হানিশ তৈরী করেন নারীবাদের বিখ্যাত স্লোগান—'পারসোনাল ইজ পলিটিকাল' অর্থাৎ যা ব্যক্তিগত তাই রাজনৈতিক। সমানাধিকারের দাবীর চেয়ে এগিয়ে দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদ লিঙ্গশোষণ ও লিঙ্গাশ্রয়ী স্তরবিন্যাসের উন্মোচন এবং নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও নারীবাদের লক্ষ্য নির্ণয়ে জোর দিয়ে নারীবাদের প্রধান তিনটি ঘরাণা, উদারপন্থী, চরমপন্থী ও সমাজতন্ত্রী নারীবাদের সূত্রপাত করে।

Scanned with CamScanner

লিবারাল বা উদারপন্থী নারীবাদ

লিবারাল বা উদারপন্থী নারীবাদকে নারীবাদের সবচেয়ে পরিচিত ও জনপ্রিয় ঘরানা বলা যায়, যার মূল লক্ষ্য ছিল ঘরে বাইরে নারীর সমানাধিকার ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং পরিবারের বাইরের প্রকাশ্য জনজীবনে ও পেশাক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণের কৃত্রিম বাধা দূর করা। সাম্য ও অসাম্য, নারী পুরুষের পার্থক্য, অন্দরমহল ও বহির্মহল, লিঙ্গপরিচয় ও যৌনপরিচয় ইত্যাদি বিষয়গুলির বিশ্লেষণ এই সময়েই শুরু হয়। উদারপন্থী নারীবাদীরা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের চেয়ে সমাজব্যবস্থার সংস্কারেই বিশ্বাসী ছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিলের কল্যাণমুখি উদারপন্থায় অনুপ্রাণিত এই ঘরানার উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক ছিলেন বেটি ফ্রেডান ও নাওমি উলফ।

র‍্যাডিকাল বা চরমপন্থী নারীবাদ

র‍্যাডিকাল বা চরমপন্থী নারীবাদ পুরুষশাসিত বহির্মহলের মাহাত্মকে প্রত্যাখ্যান করে তার প্রতি সত্যিকারের প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং নারীত্বের সদর্থক গুণগুলিকে তুলে ধবে, পুরুষের মতো হওয়ার চেয়ে পুরুষের চেয়ে পৃথক অথচ সমকক্ষ নারী-অস্তিত্বের ওপর জোর দেন। চরমপন্থী নারীবাদীরা গুরুত্ব দেন নারীর ওপর শোষণের বিশ্লেষণে। এই মতানুসারে, নারী শোষিত হয় নারী বলেই, অন্য কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে হয়। নারীর ওপর তার লিঙ্গপরিচয়ের কারণে ঘটা সবধরণের নিগ্রহই তাই লিঙ্গশোষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই লিঙ্গশোষণের উৎস পিতৃতন্ত্র। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতি-বর্ণ-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে প্রতিটি নারীই কোন না কোন ভাবে বঞ্চনা, বৈষম্য ও শোষণের শিকার হয়। একধরণের অভিজ্ঞতার শরীক হিসেবে শোষণের প্রতিরোধের জন্য নারীদের মধ্যে ভগ্নীবন্ধন গড়ে তোলার ওপর এই মতবাদে জোর দেওয়া হয়। চরমপন্থীদের লক্ষ্য ছিল একদিকে পুরুষের স্বার্থরক্ষাকারী ও নারীবিরোধী পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিরোধের তত্ত্ব গড়ে তোলা এবং অন্যদিকে নারীত্বের শক্তিতে জোর দেওয়া। এই সূত্রে নারীর শরীরের ওপর নারীর অধিকারের বিষয়টিও এই মতবাদে প্রধান হয়ে ওঠে। অ্যাড্রিয়েন রিচ ও কেট মিলেট ছিলেন এই ঘরানার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা।

মার্কসিস্ট-সোশালিস্ট বা সমাজতন্ত্রী নারীবাদ

মার্কসিস্ট-সোশালিস্ট বা সমাজতন্ত্রী নারীবাদের প্রবক্তা ছিলেন জুলিয়েট মিচেল, শীলা রোবোথাম, মিশেল ব্যারেট প্রমুখ। এই ঘরানায় ১৯৬০ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত মার্কসীয় শ্রেণীতত্ত্বের ছাঁচে নারীবাদের জোরালো মতবাদ তৈরী হয় এবং সাম্প্রতিক সাইকোঅ্যানালিসিস, পোস্ট মডার্ন ও জাতি-প্রজাতি ভিত্তিক ফেমিনিজমের মধ্যে তার উত্তরাধিকার প্রবাহিত হচ্ছে। মার্কসীয় নারীবাদীরা দেখান পিতৃতন্ত্র ও পুঁজিবাদের যৌথ চাপে সংসারে ও অর্থনীতির দ্বৈতক্ষেত্রে মেয়েরা শোষিত হয়, ফলে তারা পুরুষের চেয়ে বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরী করে। পিতৃতন্ত্র জৈবিক লিঙ্গপার্থক্যের যুক্তিকে বাড়িয়ে নিয়ে অন্দরমহলে মেয়েদের মজুরিহীন শ্রম ও সন্তানপালনকে এবং বহির্জগতের শ্রমবাজারে অসাম্যকে মেয়েদের সাংসারিক দায়দায়িত্বের যুক্তিতে বৈধ ঘোষণা করে বলেই পুঁজিবাদীরা সেই মতাদর্শ সমর্থন করে। পুরুষ শ্রমিক ঘরে এবং বাইরে সুবিধেজনক অবস্থায় থাকে। ঘরে স্ত্রীর মজুরিহীন সেবা ও আনুগত্য এবং বাইরে মেয়েদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামুক্ত চাকরি তাদের এই সুবিধে তৈরী করে। পিতৃতন্ত্র ও পুঁজিবাদের এই পারস্পরিক সমঝোতায় মেয়েরা আরও কোণঠাসা হয়। নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিক ডরোথি স্মিথ মার্কস ও ফুকোর ক্ষমতাতত্ত্বের সংমিশ্রণে শাসনের সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পুরুষের তৈরী বাচন বিশ্লেষণ করেন। প্যাট্রিশিয়া হিল কলিন্সও একই ধারায় শ্বেতাঙ্গ পুরুষের তৈরী জাতিবিদ্বেষী, শ্রেণীবিদ্বেষী, নারীবিদ্বেষী ক্ষমতাজালের উন্মোচন করেছেন।

সত্তরদশকে নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের অন্যতম বিশ্লেষণ প্রকল্প ছিল প্রাত্যহিক দিনযাপনের সংস্কৃতির মধ্যেও যেভাবে পিতৃতন্ত্র বোনা আছে তার সূক্ষ্ম উপায়ের বিশ্লেষণ। যা ব্যক্তিগত তাও রাজনৈতিক বা পারসোনাল ইজ পলিটিকাল - নারীবাদের এই বিখ্যাত স্লোগানের মধ্যেই দৈনন্দিন জীবনের এই রাজনীতির প্রসঙ্গ নিহিত আছে। এর অর্থ হল, নারীদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং তা বৃহত্তর সামাজিক বৈষম্যের চিহ্ন ও দৈনন্দিন দিনযাপনের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকীকৃত। এই দৈনন্দিন দিনযাপনের মধ্য দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি কিভাবে মেয়েদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে সে বিষয়ে নারীবাদীরা ক্রমশই অনুসন্ধানী হয়ে ওঠেন এবং শোষণের ও শোষণ-স্বাভাবিকীকরণের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করতে শুরু করেন। তারা লক্ষ্য করেন, ধর্ম, লোকাচার, শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্যের মতো ক্ষেত্রগুলিকে কৌশলগত ভাবেই লিঙ্গবৈষম্যকে সহনীয় ও

Scanned with CamScanner

স্বাভাবিক করে তোলার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং এটাই ছিল পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার সেরা প্রযুক্তি। দ্বিতীয় তরঙ্গের শীর্ষসময়ে, অর্থাৎ ১৯৭০ সাল নাগাদ, নারীবাদের বিষয়, লক্ষ্য ও সংজ্ঞা ছিল নির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারিত। তখন নারীবাদী তাত্ত্বিকরা নির্দিষ্ট করেই বলছিলেন যে নারীবাদের বিষয় : নারী; লক্ষ্য : নারীর অধীনতার অবস্থান পরিবর্তন করা এবং কার্যকরী সংজ্ঞা: পিতৃতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে এক রাজনৈতিক সংগ্রামের নাম নারীবাদ।

নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ

পরবর্তী দুই দশকে নারীবাদ যত বিস্তারিত ও বৈচিত্রময় বাঁক নিয়েছে, ততই সর্বজনগ্রাহ্য কোন নির্দিষ্ট বিষয়, সংজ্ঞা ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। নিশা কাভকা[২] লক্ষ করেন, 'একসময়ে যে নারীবাদী প্রকল্পকে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল, ১৯৭০-এর শেষ থেকে ১৯৯০-এর মধ্যে তার অবিরত বিস্তার ও বিভাজনের অবস্থান থেকে সেই নারীবাদের বিষয় ও লক্ষ্য পরিণত হয়েছে চিহ্নিতকরণে অসম্ভব এক প্রকল্পে, এমনকি, দৃশ্যমান অদৃশ্যতার এক কূটভাষিক অবস্থায়। গত একদশকের নতুন চিন্তাপ্রবাহ ও তাত্ত্বিক ধারণাগুলিতে নারীবাদের বিষয় বা লক্ষ্য সম্বন্ধে কোন স্বচ্ছ বা সর্বজনগ্রাহ্য অবস্থান আর সম্ভব নয়, এমনকি কাভকার মতে কাম্যও নয়। তার মতে, 'নারীবাদকে এখন আর কোন একক নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় বাঁধা যায় না, একটি সংহত প্রকল্প হিসেবে গণ্য করা যায়না, এমনকি নারী নামক কোন একমাত্রিক জনগোষ্ঠির প্রসঙ্গে সম্পর্কায়িত করাও যায় না; নারীবাদের কোন একক ইতিহাস নেই বরং এই শব্দবন্ধের আওতায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষেরা ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়েছে এবং তা করতে গিয়ে অনেকান্ত ইতিহাস তৈরি করেছে। অনেকান্তের ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নারীবাদের নিছক একমাত্রিক ধারণার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সংগ্রাম ও বৈচিত্র্যের প্রতি একধরণের অবিচার করা হয়। নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের পরবর্তী অধ্যায়ে একক নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞায় নারীবাদের বর্ণনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে, কিন্তু বিগত শতাব্দির শেষ তিন দশকে নারীবাদের ছাতার নিচে সামাজিক ন্যায়ের জন্য সমস্ত সংগ্রামের মধ্যেই নারীবাদের ইতিহাস থেকে গেছে। নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গোত্তর অধ্যায়ের বর্ণনা করে মিশেল ব্যারেট ও বলেন, ১৯৭০-এর বস্তুবাদী সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাংস্কৃতিক বাঁক নিয়ে নারীবাদ ১৯৮০ ও ১৯৯০-এ ক্রমশ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক তত্ত্বের ডিসকারসিভ

কনসর্ন বা বাচনিক আগ্রহের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। পূর্ববর্তী চিন্তাস্রোতও একমুখী ছিল না; মার্কসবাদী নারীবাদীরা যখন নারীর গৃহকর্মের ওর জোর দিয়ে, বস্তুবাদী সম্পর্কের মধ্যে নারীর অধীনতার উৎস খুঁজেছেন, অন্যদিকে তখন র‍্যাডিকাল র চরমপন্থী নারীবাদীরা কেট মিলেট ও শুলামিথ ফায়ারস্টোনের প্রভাবে নারীর জৈবিক অধীনতার কারণ হিসেবে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর প্রজনন-ভূমিকাকে চিহ্নিত করছেন। জুলিয়েট মিচেলের 'সাইকোএনালিসিস অ্যান্ড ফেমিনিজম' গ্রন্থ থেকেই বস্তুর পরিবর্তে শব্দের ওপর জোর দেওয়ার নারীবাদী ঘরানার সূত্রপাত হয়। নারীবাদী মতাদর্শের তাত্ত্বিকগণ ৭০ ও ৮০-র দশকে ফরাসি অবয়ববাদ, বিশেষত লাকানের মনোবিশ্লেষণ, আলথুসারের মতাদর্শতত্ত্ব ও রোঁলা বার্থের চিহ্নবিজ্ঞানের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হন এবং মতাদর্শ ও ভাষা সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করেন। এর সঙ্গে যোগ হয় ৮০-র দশকে ফুকোর যৌনতাতত্ত্বের প্রভাব। যার ফলে নারীবাদী সমালোচনার কয়েকটি ধারা মতাদর্শ থেকে বাচনের দিকে, একক নিষ্পেষণকারী পিতৃতন্ত্রের মধ্যবর্তী লিঙ্গ ও যৌন সম্পর্কের সম্ভাব্য সচেতনতা বিষয়ক সত্যের ধারণা থেকে যৌনতাকে ক্ষমতাপ্রয়োগের একটি নির্মাণ হিসেবে ও বিভিন্ন বাচনের একটি উৎপন্ন প্রয়াস হিসেবে বিশ্লেষণ করার দিকে মোড় নেয়। ১৯৭০ থেকে ১৯৯০-র মধ্যে নারীবাদের এই গুরুত্বপূর্ণ বাঁক লক্ষ্য করা যায়, যেখানে নারীর অধীনতাকে একটি একক বাধাদানকারী ব্যবস্থার প্রসঙ্গে, তা সে পুঁজিবাদ, পিতৃতন্ত্র, জৈবিক নিয়ম যাই হোক না কেন, ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে শুরু হয় নারীর অস্তিত্ব বা নারী হয়ে ওঠার পেছনের বাচনিক, বস্তুবাদী ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যগুলির ওপর জোর দেওয়ার প্রবণতা। ১৯৭০-এর সুবিন্যস্ত বিশ্লেষণী নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে ১৯৮০-র এই বিভিন্নতার আবেগধর্মী ও সময়বিশেষে যন্ত্রণাদায়ক বিস্তারের পেছনে বর্ণনারীবাদী ও উত্তর অবয়ববাদী সমালোচনার বাচনদুটি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, যা ৭০-এর নারীবাদের কমনালিটির স্বপ্নে চিড় ধরায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদ ছিল পশ্চিমী শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের লিঙ্গ বৈষম্য বিরোধী সার্বজনীন তত্ত্ব ও আন্দোলন। কিন্তু এই আবিশ্ব সার্বজনীন অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করেই পরবর্তী পর্যায়ে নারীবাদী ঘরানাগুলির উত্থান, যা বিশ্বাস করে কোন একক তত্ত্বই সব সমাজের সব নারীর পক্ষে সমান প্রযোজ্য হতে পারেনা এবং পশ্চিমী নারীবাদী কখনই কৃষ্ণাঙ্গ, এশীয় বা সমকামী মেয়েদের স্বার্থ সংরক্ষণ করেনা। তৃতীয় তরঙ্গে শুরু হয় উত্তর আধুনিক, উত্তর

Scanned with CamScanner

উপনিবেশবাদী, কৃষ্ণাঙ্গ বা বর্ণিল, নারী সমকামী, মনসমীক্ষণবাদী, উত্তর অবয়ববাদী ও তৃতীয় বিশ্ব কেন্দ্রিক নানা নারীবাদের উত্থান।

নারীবাদী সমাজতত্ত্ব

সূচনাপর্ব থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত সমাজতত্ত্ব ছিল প্রধানত একটি পুরুষালি শাস্ত্র, কারণ ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বে নারীর দৃষ্টিকোণ বা নারী অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ছিল সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। সত্তর দশকে নারীবাদী আন্দোলনের তীব্রতর পর্বে অন্যান্য সামাজিক শাস্ত্রগুলির মতো সমাজতত্ত্বেও 'অনুপস্থিত' নারী ও তার জগৎকে উপস্থাপনের চেষ্টা শুরু হয়, এবং ক্রমশ নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ বিশ্লেষণের পৃথক ঘরানা হিসেবে নারীবাদী সমাজতত্ত্বের উদ্ভব হয়। ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বের বেশ কয়েকজন জনক বা 'ফাউন্ডিং ফাদার' থাকলেও কোন জননী বা ফাউন্ডিং মাদার স্বীকৃতি পান নি। যদিও অগাস্ট কোঁতের 'পজিটিভ ফিলসফি' (১৮৪২) প্রকাশের আগেই বেরিয়েছিল হ্যারিয়েট মার্টিনিউয়ের সমাজতাত্ত্বিক প্রবন্ধ 'দি পলিটিক্যাল নন-এক্সিস্টেন্স অফ উইমেন' (১৮৩৭) এবং যদিও সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের আগেই নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, কিন্তু সমাজতত্ত্বের গায়ে বহুদিন পর্যন্ত তার আঁচ লাগে নি। ১৮৪৮ সালে যখন একদিকে নারী আন্দোলনের ঐতিহাসিক সেনেকা ফলস কনভেনশনের ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হচ্ছে, তখন অন্যদিকে বেরোচ্ছে কার্ল মার্কসের যুগান্তকারী গ্রন্থ 'দি কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো'। কিন্তু কোঁত, দুর্খেইম, মার্কস, ওয়েবারের মতো সমাজতত্ত্বের জনকবৃন্দ সকলেই নারী অভিজ্ঞতার গুরুত্ব এবং নারী আন্দোলনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন বলেই সূচনাপর্বে এই শাস্ত্রটি শুধুমাত্র পুরুষের অভিজ্ঞতাকেই সামাজিক অভিজ্ঞতার সার্বজনীন চেহারা বলে ধরে নেয়। ধ্রুপদীপর্বের সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি সামাজিক শাস্ত্রগুলি সবই লেখা হয় পুরুষের একপেশে দৃষ্টিকোণে, যেখানে নারীর অভিজ্ঞতা, কার্যকলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

সত্তর দশকের নারী আন্দোলনের উত্তাল জোয়ারে প্রথমে মূলস্রোত-সমাজতত্ত্বে নারীর অভিজ্ঞতা, কার্যকলাপ ও লিঙ্গবৈষম্যের বিশ্লেষণ শুরু হয় এবং ক্রমশ নারীর দৃষ্টিকোণে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের একটি নতুন ঘরানা গড়ে ওঠে, যাকে নারীবাদী সমাজতত্ত্ব বলা হয়। পামেলা অ্যাবোটের[৪] ভাষায়, 'ফেমিনিস্ট সোশিয়োলজি বা নারীবাদী সমাজতত্ত্ব নারীর জন্য হলেও শুধুমাত্র

নারী বিষয়েই নয় এবং তা নারীর অধীনতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য দায়ী পুরুষতন্ত্রের প্রতিরোধ ও মোকাবিলা করে'। জ্যানেট উলফ[৫] বলেন, 'সমাজতাত্ত্বিকেরা লক্ষ্য করেন যে, পরিবারের মতো সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরম্পরাগত ক্ষেত্রগুলি গড়ে উঠেছে লিঙ্গবৈষম্যযুক্ত ধারণার ভিত্তিতে এবং এখন ভিন্ন কার্যসূচী দিয়ে ঐ ক্ষেত্রগুলির পুনর্বিচার করা দরকার'। উলফের মতে যা 'ভিন্ন কার্যসূচী দিয়ে ঐ ক্ষেত্রগুলির পুনর্বিচার' তাকেই নারীবাদী বিশ্লেষণের ধারায় পুনর্বিশ্লেষণ বলা যায়। নারীবাদে সমাজতত্ত্বের সূত্রপাত হয় 'মেলস্ট্রিম' বা মেনস্ট্রিম সমাজতত্ত্বের চিন্তাধারার বিরোধিতা ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে। ডরোথি স্মিথ[৬] লক্ষ্য করেন, কিভাবে পুরুষের তৈরী বাচন বা 'মেল ক্রিয়েটেড ডিসকোর্স' নারীর শোষণে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। পরবর্তী কালে প্যাট্রিশিয়া হিল কলিন্স[৭] আরও স্পষ্টভাবে 'শ্বেতাঙ্গ পুরুষের দ্বারা উৎপাদিত জ্ঞানকে জাতিবিদ্বেষী, শ্রেণীবৈষম্যবাদী, লিঙ্গবৈষম্যবাদী প্রাধান্য সৃষ্টিকারী উপাদান' বা 'ম্যাট্রিক্স অফ ডমিনেশন' বলে চিহ্নিত করেন। জুডিথ স্টেসির[৮] মতানুসারে, 'ধ্রুববাদ বা প্রত্যক্ষবাদের দ্বৈততা, বিমূর্ততা ও নৈর্ব্যক্তিকতায় ব্যাপকভাবে বীতশ্রদ্ধ নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা বিষয় ও বস্তুর মধ্যে, চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে, জ্ঞান আহরণকারী ও জ্ঞাতব্যের মধ্যে এবং রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগতের মধ্যে পার্থক্যকে এবং একইসঙ্গে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষণ-শাস্ত্রগুলির স্বেচ্ছাচারী গন্ডীর মধ্যে এই পার্থক্যের প্রতিফলনকে অস্বীকার করে'। পরিবর্তে, অধিকাংশ নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা জ্ঞানার্জনের এক অখন্ড, বহুশাস্ত্র মিশ্রিত দৃষ্টিকোণের পক্ষে সওয়াল করেন যার মাধ্যমে নারী দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব প্রেক্ষাপটে তত্ত্বকে রোপণ করবে।

ম্যাগি হামের[৯] মতে, 'বিশ্লেষণকে নারীবাদী বলা যায় যখন তা নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত বিষয়গুলির মধ্যে নারী-বিষয়ক সনাতন প্যারাডাইম বা তত্ত্ববিশ্বের সামাজিক ভূমিকাগুলির প্রকৃতির ও ঐধরণের অন্যান্য কাজের নথির সমালোচনা করে'। জ্যানেট শ্যাফেজ[১০] মনে করেন, 'একটি তত্ত্ব তখনই নারীবাদী হয় যখন তাকে নারীর অবমূল্যায়নকারী ও অসুবিধে সৃষ্টিকারী স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ, প্রতিরোধ ও পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়'। চিন্তাস্তরে ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে নারীর শোষণ ও বশ্যতার জন্য নারীবাদী তত্ত্বে পিতৃতন্ত্রকে দায়ী করা হয় এবং পিতৃতন্ত্রের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নারীবাদীরা যুগান্তকারী ভূমিকা নিয়েছেন। গর্ডনের[১১] মতে, নারীর অধীন অবস্থানের এবং তার পরিবর্তনের উপায় খুঁজে বের করার লক্ষ্যে নির্ধারিত বিশ্লেষণকে ফেমিনিস্ট বা নারীবাদী তত্ত্ব বলা হয়

Scanned with CamScanner

এবং এই সংজ্ঞার সপক্ষে অসমন্ড ও থর্ন[১২] যুক্তি দেন যে একমাত্র এই সংজ্ঞাটিতেই নারীবাদী তত্ত্বের তিনটি অভিন্ন সর্বসম্মত কর্মসূচি উপস্থাপিত হয়েছে, যা হল, নারীর অভিজ্ঞতার উন্মোচণ, লিঙ্গশোষণ চিহ্নিতকরণ ও নারীর বন্ধনমুক্তির নির্দেশ।

নারীবাদী দৃষ্টিকোণে ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বের সমালোচনা

মূলস্রোতের চিন্তাধারার তুলনায় নারীবাদী চিন্তা অনেক বেশি উন্মোচনমুখী, আবিষ্কারপ্রবণ ও প্রতিবাদী। সামাজিক শাস্ত্রের আঙিনায় লিঙ্গপরিচয়ের দৃষ্টিকোণ ক্রমশ লিঙ্গবৈষম্যের প্রেক্ষাপট ও রাজনীতি উন্মোচন করে সমাজতত্ত্বের প্রচলিত ও প্রথাগত ধ্যানধারণাগুলি পাল্টে দিয়েছে। প্লেটো থেকে সাম্প্রতিক পশ্চিমী চিন্তাধারার মূলস্রোতকে নারীবাদীরা 'মেলস্ট্রিম' বা পুরুষালি চিন্তাস্রোত বলে চিহ্নিত করেন। ক্রিস বিসলের[১৩] মতে নারী ও তার সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের ভাষ্যকে বর্জন, প্রান্তিকীকরণ এবং তুচ্ছকরণের তিন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূলস্রোতের সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তা নারীবাদী চিন্তার সঙ্গে দূরত্ব ও পার্থক্য তৈরী করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাস্রোতের অধিকাংশই পুরুষের লিখিত পুরুষের জন্য এবং পুরুষের প্রসঙ্গে। পুরুষের প্রাধান্য ও কেন্দ্রিকতাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া থেকেই পুরুষের চিন্তার ইতিহাসে নারীবিদ্বেষ বা মিসোজিনি তৈরী হয়েছে এবং তার বিশ্লেষণ, প্রতিরোধ ও সংশোধনের লক্ষ্যেই নারীবাদী তত্ত্বের উত্থান।

প্রথাগত পশ্চিমী জ্ঞানতত্ত্বের মধ্যে যে নারীবিরোধিতা বা নারীবিদ্বেষ গোপনে কাজ করে তা নারীবাদীদের সমালোচনার একটি প্রধান ক্ষেত্র। জ্ঞানতত্ত্বের গোপন নারীবিদ্বেষ বিষয়ে নারীবাদী তাত্ত্বিকদের প্রথম প্রতিক্রিয়া এরকম যে, পশ্চিমী সামাজিক-রাজনৈতিক তত্ত্ব থেকে নারী এবং নারী তাত্ত্বিকরা বাদ গেছেন এবং নারীবাদীদের কাজ হবে মূলস্রোতের অধিকাংশ অক্ষুন্ন রেখেও তাদের ফিরিয়ে আনা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। একে 'ইনক্লুশন অ্যাডিশন অ্যাপ্রোচ' বলা হয়। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াটি 'ক্রিটিক, রিজেক্ট অ্যান্ড স্টার্ট এগেন অ্যাপ্রোচ', যেখানে বলা হয় সাম্প্রতিক নারীবাদী দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে সনাতন পশ্চিমী তত্ত্ব অন্তঃসারশূন্য এবং তার নির্মাণ লিঙ্গাশ্রয়ী উচ্চক্রমের ধারণার ভিত্তিতে। তৃতীয় প্রতিক্রিয়া 'ডিকনস্ট্রাক্ট অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম অ্যাপ্রোচ', যেখানে বলা হয় অতীতের পুরুষ প্রাধান্যবাদী দৃষ্টিকোণকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে কোন নতুন তাত্ত্বিক কাঠামো

বানানো সম্ভব নয়। বরং সনাতন পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাকে যত বিশ্লেষণ ও বিনির্মাণ করা যাবে ততই নারীবাদী চিন্তার প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট তৈরী হবে।

পশ্চিমী তত্ত্ব সম্বন্ধে নারীবাদীদের আরেকটি প্রধান আপত্তির ক্ষেত্র নারীকে দ্বিতীয় লিঙ্গ বা পুরুষের তুলনায় ছোট করে দেখানোর প্রবণতা। মূলস্রোতের সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের অধঃস্তন গণ্য করার প্রবণতাকে সবসময়েই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করে। নারী-পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য ও ক্ষমতাচক্র কাজ করে মূলস্রোত কখনই তার রাজনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেনি। মুক্তি, সাম্য ও মানবাধিকারের প্রগতিশীল তত্ত্বগুলিও নারীর অধীনতা ও অধিকারহীনতাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিল। নারীর এই দ্বিতীয় লিঙ্গের ভূমিকা মূলস্রোতে দুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমত, কোন কোন ভাষ্যে নারীকে আংশিক সাহায্যকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে নারীর ভূমিকা মূলত পুরুষের সেবাকারিনী, গৃহিণী ও সন্তান পালিকার। যেমন এরিস্টটল মনে করতেন ক্রীতদাস, নারী ও শিশুদের মধ্যে কোন যুক্তিবাদী মন নেই। সুতরাং নারীর নৈতিকবোধ অস্থির এবং তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। ম্যাকস ওয়েবার[১৪] একইভাবে নারীকে পুরুষের অধীন সেবাকারিণী হিসাবে গণ্য করেছেন। নারীর দ্বিতীয় যে ভাষ্য মূলস্রোতে পাওয়া যায় সেখানে নারী পুরুষের চেয়ে আলাদা, কিন্তু পরিপূরক। আপাতভাবে এখানে দুই লিঙ্গকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে মনে হলেও কার্যত নারীকে আলাদা হিসেবে নয় বরং পুরুষের বিপরীত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে পুরুষকে শ্রেষ্ঠ মানব ধরে নিয়ে নারীর সংজ্ঞা তৈরী হয় যা কিছু পুরুষের বিপরীত তাই দিয়ে। এখানেও নারীর সমকক্ষ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিকৃতি তৈরী হয় না।

মূলস্রোত যেভাবে পুরুষের অভিজ্ঞতাকে শাশ্বত ও সার্বজনীন মানবিক অভিজ্ঞতা বলে উপস্থাপন করে, নারীবাদীদের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি সেখানেই। পশ্চিমী উপলব্ধির জগত গড়ে উঠেছে অনেকগুলি অসম জুড়ির ধারণার ওপর নির্ভর করে এবং জুড়ির মধ্যে শ্রেষ্ঠতরটি সবসময়ে পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখানো হয়। এই অসম জুড়িতে সবসময়ে প্রথমটি উচ্চমানের ও দ্বিতীয়টি নারীবাচক। এলেন সিক্সু[১৫] পশ্চিমী চিন্তাজগতে প্রচলিত কয়েকটি অসম জুড়ির উল্লেখ করেছেন, যেমন, পুরুষ-নারী, কর্তা-কর্ম, সংস্কৃতি-প্রকৃতি, যুক্তি-আবেগ, মানব সত্তা-অনসত্তা, স্বাধীন-পরাধীন, মুক্তি-বন্ধন, সক্রিয়-নিস্ক্রিয়, চিরায়ত-নির্দিষ্ট,

Scanned with CamScanner

সদর-অন্দর, রাজনৈতিক-ব্যক্তিগত, অ্যাডাম-ইভ ইত্যাদি। পিতৃতান্ত্রিক ভাষার এই দ্বিমাত্রিক কৌশল ও তুলনামূলক বৈপরীত্যের ছক প্রমাণ করে পুরুষের সক্রিয়তা ও নারীর নিষ্ক্রিয়তা। 'ভাষার সূক্ষ্ম কৌশলে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে কে যন্ত্রী আর কে যন্ত্র। প্রথম লিঙ্গ পুংলিঙ্গ, যে প্রত্যক্ষ, ইতিবাচক, শক্তিমান, বিজয়ী; আর স্ত্রীলিঙ্গ দ্বিতীয়, যে সবসময়েই অবলা, অপ্রত্যক্ষ, নেতিবাচক, পুরুষের জয়ে গরবিনী। এই ছক ভেঙে প্রাণ, স্ফূর্তি ও শক্তির উৎস হিসেবে নারীর পুনর্নির্মাণ চেয়েছেন সিক্সু। অনেক আগে নারী আন্দোলনের প্রথম যুগে সিমোন দ্য বোভোয়া লক্ষ্য করেছিলেন পুরুষের সমাজে নারী কিভাবে 'অন্যজীব' হিসেবে, 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলিঙ্গের সামাজিক নির্মাণ ঘটে স্ত্রীজাতিকে দমিয়ে রাখার জন্যই। নারী হয়ে ওঠার সেই প্রক্রিয়া, সেই স্ত্রীলিঙ্গনির্মাণ আজও এখনও চলছে পূর্ণশক্তিতে'[১৬]।

ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বে নারী উপেক্ষিত

সাধারণভাবে পশ্চিমী জ্ঞানতত্ত্ব ও সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তার মূলস্রোতের বিরুদ্ধে নারীকে বর্জন, তুচ্ছকরণ ও প্রান্তিকীকরণের যে অভিযোগ নারীবাদীরা করেন, নির্দিষ্টভাবে সমাজতত্ত্বের মূলধারাও সেই দোষে সমানভাবে অভিযুক্ত। নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিকদের প্রধান অভিযোগ এই যে ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বের সামাজিক জগতে এবং সামাজিক বিশ্লেষণে নারী উপেক্ষিত ও অনুপস্থিত থাকে। ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বের ভাষা ও দৃষ্টিকোণ পুরুষের; এবং তা শুধু পুরুষালি কার্যকলাপের, পুরুষের অভিজ্ঞতার ও সমাজে পুরুষশাসিত অংশেরই বিশ্লেষণ করে। মার্কস, দুরখেইম, ম্যাকস ওয়েবার প্রমুখ সমাজতত্ত্বের জনকেরা উনিশ শতকের অধিকাংশ ইয়োরোপীয় চিন্তাবিদদের মতই পুরুষের কর্মকান্ডের জগতকেই সম্পূর্ণ সামাজিক জগত বলে ধরে নিয়েছিলেন।

পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গেসঙ্গে আধুনিক, নাগরিক, শিল্পসমাজে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে পাবলিক-প্রাইভেট বা সদর-অন্দর বিভাজন। সনাতন সমাজে পুরুষপ্রাধান্য ও লিঙ্গাশ্রয়ী শ্রমবিভাজন প্রচলিত থাকলেও অন্দর-বাহির বিভাজনের কঠোরতা ছিল না। পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে বহির্জগতে পুরুষের কার্যকলাপ ও পুরুষ প্রাধান্য বাড়তে থাকে এবং অন্দরের অবরোধে নারী গৃহবন্দী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগতের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জগত থেকে নির্বাসিত হয়। নারীর গৃহবন্দিত্বকে বাধ্যতামূলক করতে মিষ্টি কথার প্রলেপে তাকে অন্দরলক্ষ্মী

বলে বর্ণনা করা হয়, পুরুষের সেবায় নিয়োজিত কল্যাণী মূর্তির গুণগান শুরু হয়। কিন্তু একইসঙ্গে নারীকে গৃহবন্দী অন্দরলক্ষ্মীর ভূমিকায় আটকে রাখার মাধ্যমেই চলতে থাকে তাকে দ্বিতীয় লিঙ্গ গণ্য করা, নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা ও পুরুষের অধীন রাখার প্রক্রিয়াও। মেয়েদের এই ঐতিহাসিক প্রান্তিকীকরণকে সমর্থন ও স্বাভাবিকীকরণ করেই ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বের ভিতনির্মাণ হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষের দিকের ইংল্যান্ডেও আইনগত বা উদার চিন্তাধারায় ব্যক্তি হিসেবে মেয়েদের গণ্য করা হয়নি। তখনও পরিবারের ওপর পুরুষের প্রভুত্ব ছিল তর্কাতীত এবং মেয়েদের বহির্জগত থেকে নির্বাসিত অবরোধের জীবন কাটাতে হত। একদিকে জন স্টুয়ার্ট মিল ও টেইলর এবং অন্যদিকে প্রথম পর্যায়ের মার্কিন নারীবাদী এলিজাবেথ ক্যান্ডি স্ট্যান্টন ও সুজান বি অ্যান্টনি যুক্তি দেন যে মেয়েদের সমানাধিকার পেতে হলে চাই পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা, যার প্রধান পদক্ষেপ হবে মেয়েদের ভোটাধিকার। পরবর্তীকালে মিল মেয়েদের সম্পত্তির ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং নারী ও শিশুদের স্বার্থ রক্ষাকারী অন্যান্য বিষয়ের সপক্ষেও উদ্যোগী হয়েছিলেন। পাশাপাশি নারী আন্দোলন চলতে থাকলেও পশ্চিমী দেশগুলিতে আনুষ্ঠানিক সমানাধিকার আরও অনেক পরে ১৯১৮ সালের পর থেকে স্বীকৃত হতে থাকে। কিন্তু সমাজতত্ত্বের মূলস্রোতে তখনও এর কোন প্রভাব পড়েনি।

ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বে সামাজিক জগত ও সমাজতত্ত্বের অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা

সামাজিক জগতের সংজ্ঞার ভিত্তিতে ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণ তৈরী হয়। দুরখেইম, ওয়েবার, মার্কস সকলেই সামাজিক জগতের নিজস্ব সংজ্ঞার ভিত্তিতে তাদের আলোচনা করেছেন। নারীবাদী ও পরবর্তী অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন, সামাজিক জগতের এই সংজ্ঞা ও ধারণা তৈরী হয়েছিল মানবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি বড় অংশকে বাদ দিয়েই। নারী ও শিশুর সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, এবং সংসার, গৃহস্থালি, পরিবার ও মানব সম্প্রদায়ের যেসব প্রতিষ্ঠানে নারী ও শিশুরা কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেয়, তার বিশ্লেষণের প্রতি কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। মার্কস তাঁর শ্রমতত্ত্বে গৃহশ্রমকে কোন গুরুত্ব দেন নি কারণ ঐ শ্রমে কোন মজুরি নেই। শুধুমাত্র বহির্জগতের মজুরিযুক্ত কাজকেই শ্রম বলে ধরে নেওয়া এবং গৃহস্থালির উদয়াস্ত শ্রমকে শ্রম বলে উল্লেখ না করার মধ্যেই

Scanned with CamScanner

প্রথাগত পিতৃতান্ত্রিক পক্ষপাত লুকিয়ে আছে। নারী নীরবে অন্দরমহলে গৃহশ্রমিকের ভূমিকা না সামলালে পুরুষ বহির্জগতের শ্রমিকের ভূমিকা পালন করতে পারত না, অর্থাৎ বাইরের শ্রম থেকে পুরুষ যে উপার্জন করেন তাতে গৃহশ্রমিক নারীরও সমান অংশীদারী থাকে, ঠিক যেমন নারীর শ্রমে রচিত গৃহে পুরুষের অধিকার স্বতঃসিদ্ধ। মার্কসের সময়ে বাইরের কাজের জগতে মেয়েরা অংশ নিত না, অথচ মার্কসের সামাজিক জগত রচিত হয়েছে পণ্য, পণ্যবিনিময়, শ্রমবাজার ও উপভোগের বিশ্লেষণ দিয়ে। পণ্য হিসেবে নারী, পরিবার ও গৃহস্থালির শ্রমক্ষমতার কিভাবে মূল্যায়ন হবে সে বিষয়ে মার্কস কোন বিশ্লেষণ করেন নি। শ্রম ও গৃহশ্রমকে সমমর্যাদা না দেওয়ার জন্য নারীবাদীরা মার্কসের তত্ত্বের সমালোচনা করেন।

দুরখেইম তাঁর শ্রম বিভাজন তত্ত্বেও একইভাবে নারীকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পুরুষের অধিকৃত বহির্জগতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন। বহির্জগতের নেপথ্যে অন্দরচারিণীরা কিভাবে পুরুষের শ্রম ও উপার্জনে সহযোগীর ভূমিকা নিচ্ছিল সে বিষয়টি মার্কস, দুরখেইম, ওয়েবার কেউই বিশ্লেষণযোগ্য মনে করেন নি, উপরন্তু লিঙ্গভিত্তিক অসম শ্রমবিভাজনকে স্বাভাবিক, ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। মানবজাতির অর্ধেকের অভিজ্ঞতা বাদ দিয়েই সমাজতত্ত্বের দুটি মৌলিক প্রত্যয়-দুরখেইমের সামাজিক তথ্য ও ওয়েবারের সামাজিক আচরণের ধারণা গড়ে উঠেছিল। এমনকি, এরা সামাজিক স্তরবিন্যাসের যে বিশ্লেষণ করেছেন, দুরখেইমের শ্রমবিভাজন তত্ত্ব, মার্কসের শ্রেণী-শ্রেণীসংগ্রাম-শোষণ-উদ্বৃত্ত শ্রম-উপভোগ বিষয়ে তত্ত্ব, ওয়েবারের শ্রেণী-মর্য্যাদা-কর্তৃত্ব-আমলাতন্ত্র সংক্রান্ত তত্ত্ব, সর্বত্রই বিস্ময়করভাবে নারী অনুপস্থিত। অর্থাৎ ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বের সামাজিক বিশ্লেষণের জগত প্রায় নারীবর্জিতভাবে গড়ে উঠেছে এবং নারী প্রসঙ্গে খুব সামান্য যে উল্লেখ আছে তা এতই সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ যে ঐ সমাজে নারী না থাকলেও তত্ত্বগুলি একইরকম থাকত।

ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বে নারী-পুরুষের পার্থক্যের অসম্পূর্ণ বিশ্লেষণ

ধ্রুপদী সমাজতাত্ত্বিকরা ধরে নিয়েছিলেন যে নারী ও পুরুষের পার্থক্য প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক এবং এই দুই লিঙ্গের শারীরিক পার্থক্য ও সামাজিকভাবে নির্মিত পার্থক্যকে তারা আলাদা করে বিশ্লেষণ করেন নি। নারী ও পুরুষের শারীরিক পার্থক্য সত্যই প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক, কিন্তু তার ভিত্তিতে কৃত্রিমভাবে যে আর্থ-

সামাজিক-রাজনৈতিক পার্থক্য ও বৈষম্য গড়ে তোলা হয়েছে তা স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নয়। সিডির পর্যবেক্ষণ অনুসারে 'নারীকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে দেখা হয়েছে', আর অন্যদিকে পুরুষকে দেখানো হয়েছে সংস্কৃতির অনুষঙ্গে, নারীকে দেখানো হয়েছে আবেগনির্ভর আর পুরুষকে যুক্তিনির্ভর। দুরখেইম মনে করতেন, সমাজতত্ত্বে জীববিজ্ঞানের কোন গুরুত্ব নেই, সামাজিক আদানপ্রদানই সামাজিক তথ্যের উৎস। কিন্তু, নারী প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে সেই দুরখেইমও জীববিজ্ঞানের পার্থক্যকে সামাজিক পার্থক্যে রূপান্তরিত করার প্রবণতার উর্দ্ধে উঠতে পারেননি।

ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বে সামাজিক বৈষম্যের অসম্পূর্ণ বিশ্লেষণ

ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বে সামাজিক পার্থক্য ও বৈষম্যের ওপর আলোকপাত করা হয়। মার্কস এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। দুরখেইম ও ওয়েবারও সামাজিক পার্থক্য ও বৈষম্যের বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন। তবু ধ্রুপদীপর্বে লিঙ্গবৈষম্য, জাতিবৈষম্য ও প্রজাতিবৈষম্য (জেনডার, রেস, এথনিক ইনইকুয়ালিটি) সম্বন্ধে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রায় অনুপস্থিত। পরবর্তীকালে নারীবাদী তাত্ত্বিকরা যে পিতৃতন্ত্রকে একটি বৈষম্যবাদী সামাজিক ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করেছেন, ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বে তার বিশ্লেষণ নেই বললেই চলে। যদিও প্যাট্রিয়ার্কি বা পিতৃতন্ত্র শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ম্যাক্স ওয়েবার[১৮], সনাতন কর্তৃত্বের প্রধান ধরণ প্যাট্রিয়ার্কি বা প্যাট্রিয়ার্কালিজম বলতে তিনি পরিবারের সদস্যদের ওপর বাবা, স্বামী বা বয়স্ক পুরুষের, নারী ও শিশুর ওপর পুরুষের, অপটু দুর্বলের ওপর রাজার শাসন বুঝিয়েছেন। প্যাট্রিয়ার্কের পক্ষে তার অধীন সব নারীই তার প্রজা, 'তা সে স্ত্রীই হোক বা দাসী'[১৯]। এডাম ও সিডি[২০] লক্ষ করেন, ওয়েবার পিতৃতন্ত্রকে স্বাভাবিক, ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য ও অপরিবর্তনীয় দেখিয়ে পিতৃতান্ত্রিক লিঙ্গবৈষম্যের স্বাভাবিকীকরণ করেন। এঙ্গেলসের মতের বিপরীতে ওয়েবারের বিশ্বাস ছিল যে, অতীতে মাতৃতন্ত্র কখনই ছিল না বরং পুরুষের আরও বেশি প্রাধান্য ছিল এবং সাংসারিক ক্ষেত্রে নারীর কর্তৃত্ব থাকলেও, প্যাট্রিয়ার্কের তুলনায় তা নেহাতই গৌণ ছিল[২১]। তার মতে পিতৃতন্ত্র ঐতিহ্য দ্বারা এবং 'দীর্ঘদিনের নিয়ম ও কর্তৃত্বের পবিত্রতা' দ্বারা নিয়মসিদ্ধ। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বিশ্লেষণে ওয়েবারের মডেলটি ছিল পুরোপুরি মেল মডেল বা পুরুষের

Scanned with CamScanner

দৃষ্টিকোণে তৈরি কাঠামো। ধ্রুপদী সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে শুধুমাত্র জন স্টুয়ার্ট মিল ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের বিশ্লেষণেই নারী-পুরুষ সম্পর্কের অসাম্য ও বৈষম্যের প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পেয়েছে। অন্যদিকে মেরি উলস্টোনক্রাফ্ট, সিমোন দ্য বোভোয়া, থেকে কেট মিলেট, বেটি ফ্রেডান, জ্যানেট উল্‌ফ হয়ে আজ পর্যন্ত সমস্ত নারীবাদী তাত্ত্বিকেরাই লিঙ্গশোষণের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে পিতৃতন্ত্রকে চিহ্নিত করেন এবং জুলিয়েট মিচেল[২২] লিঙ্গবৈষম্যকে সনাক্ত করেন সমাজের 'প্রাচীনতম বৈষম্য' হিসেবে। এই বৈষম্যের প্রসঙ্গ সমাজতত্ত্বের সূচীপত্রে সবচেয়ে পরে সংযোজিত হয়েছে।

প্যাট্রিশিয়া লেঙ্গারম্যান ও জিল নিয়েব্রাগ-ব্রান্টলের[২৩] মতে ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বে নির্মিত এই একপেশে সামাজিক বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিকদের যে তিনটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহল, ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বে মেয়েরা কোথায় গেল? নারীপ্রসঙ্গের এই অনুপস্থিতি কেন? এবং কিভাবে এই একপেশে পিতৃতান্ত্রিক বিশ্বের পরিবর্তন ও উন্নতি করা সম্ভব?

নারীবাদী সমাজতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে নারীবাদীরা এই বৈপ্লবিক উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন যে সমাজতত্ত্বে বিশ্লেষিত অভিজ্ঞতাগুলি সবই শুধু পুরুষের অর্থাৎ মানবসমাজের অর্ধেকের অভিজ্ঞতা। অর্ধেক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যা তৈরী হয়েছে আসলে তা অর্ধেক সমাজতত্ত্ব। নারীবাদী সমাজতত্ত্ব শুরু থেকেই মনে করে যে কোন গবেষক বা পর্যবেক্ষকই সম্পূর্ণ স্বার্থহীন ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বে সামাজিক সংগঠনগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে আপেক্ষিকভাবে সুবিধেজনক অবস্থান থেকে। নারীবাদী তত্ত্বের ক্ষেত্রেও তাই নিজেদের চিহ্নিত নারীবাদী তাত্ত্বিক অবস্থান থেকেই তত্ত্ব তৈরী করতে হবে। নারী-কেন্দ্রিক সমাজতত্ত্বের পথপ্রদর্শক ডরোথি স্মিথের প্রতি ঋণস্বীকার করে পরবর্তী জেসি বার্নাড, ন্যানসি শোডো, ক্যারল গিলিগান, হার্ভিং, হান্টক, অদ্রে লরদে, অ্যাড্রিয়েন রিচ প্রভৃতি অসংখ্য নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিকের মিলিত প্রয়াস থেকে বলা যায় যে নারীবাদী সমাজতত্ত্বের বৈশিষ্টগুলি হল :

*নারীবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব (ফেমিনিস্ট ডায়ালেকটিকস) যা দ্বান্দ্বিক চিন্তার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী।

*নারীবাদী সমাজতত্ত্ব মহাসমাজবিন্যাসের (ম্যাক্রো-সোশাল অর্ডার) একটি বিশিষ্ট ছাঁচ।

*নারীবাদী সমাজতত্ত্ব অনুসমাজবিন্যাসে (মাইক্রো-সোশাল অর্ডার) নারী-সম্পর্কিত পরিস্থিতির এমন এক উন্মোচন যা সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সনাতন সমাজতাত্ত্বিক ধারণাগুলিকে পাল্টে দেয়।

*নারীবাদী সমাজতত্ত্ব সমাজতত্ত্বের বিষয়কেন্দ্রিক (অবজেকটিভ) চিন্তার ছাঁচের একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক (সাবজেকটিভিটি) সংশোধন।

নারীবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব (ফেমিনিস্ট ডায়ালেকটিকস)

নারীবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব বা ফেমিনিস্ট ডায়ালেকটিকস আসলে একটি জ্ঞানকেন্দ্রিক সমাজতত্ত্ব যা গড়ে ওঠে নারীর মৌলিক জীবন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, নারীবাদকে একটি বিশ্বদর্শন হিসেবে ধরে নিয়ে। জ্ঞানকেন্দ্রিক সমাজতত্ত্ব অনুসারে সামাজিক কাঠামোয় বিভিন্নভাবে অবস্থিত ব্যক্তির বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বজ্ঞানভান্ডার গড়ে ওঠে। ব্যক্তি তার অবস্থানগত অভিজ্ঞতা ও স্বার্থের ভিত্তিতে তাদের জ্ঞান গঠন করে, নারীবাদী জ্ঞানভান্ডারও অগণিত নারীদের অবস্থানগত অভিজ্ঞতা ও স্বার্থের ওপর গঠিত কারণ নারীর সত্য অভিজ্ঞতাই নারীবাদী জ্ঞানভান্ডারের ভিত্তি। মার্কস যেখানে থেমে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে শুরু করে নারীবাদী দ্বন্দ্বতাত্ত্বিকরা সমাজের তিনটি শ্রেণীকে সনাক্ত করেছেন,-মালিক, শ্রমিক ও নারী। নারীদের মধ্যেকার অবস্থানগত ভিন্নতাও তারা ব্যাখ্যা করেন। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে নারীবাদীরা মার্কসের ক্ষমতার শ্রেণী-ছাঁচের ধারণা অতিক্রম করে, জোট ও বিরোধিতার সদা পরিবর্তনশীল বিন্যাসের মধ্য দিয়ে পরস্পর সম্পর্কিত অসম ক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠীগুলির জটিল ব্যবস্থার বিশ্লেষণের একটি ছাঁচ তৈরী করেন। নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিকরা মূলত ফলিত কর্মপ্রক্রিয়ার একটি তাত্ত্বিক ভিত তৈরী করতে চান, যা সাম্যবাদী বাচন মুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজতত্ত্বের প্রচলিত চর্চার পুনর্বিন্যাসের ওপর নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিকরা গুরুত্ব দেন।

নারীবাদী সমাজতত্ত্বে নিখিলসমাজবিন্যাস (ম্যাক্রো সোশাল অর্ডার)

নিখিলসমাজবিন্যাস সম্বন্ধে নারীবাদী ধারণায় ব্যক্তির ওপর মতাদর্শ ও সমাজকাঠামোর প্রভাবের গুরুত্ব বোঝা যায়। নারীবাদীরা প্রচলিত কাঠামো-

Scanned with CamScanner

ক্রিয়াবাদী (স্ট্রাকচারাল-ফাংশনাল) সমাজতত্ত্বকে শ্বেতাঙ্গ, উচ্চশ্রেণীভুক্ত, পরিণতবয়স্ক পুরুষের একপেশে দৃষ্টিকোণ হিসেবে বর্ণনা করেন, যেখানে অ-শ্বেতাঙ্গ, নিম্নশ্রেণী, নাবালক ও নারীর পরিস্থিতির কোন প্রতিফলন নেই। নারীবাদী সমাজতত্ত্ব মার্কসের অর্থনৈতিক উৎপাদনের ধারণাকে বাড়িয়ে নিয়ে সামাজিক উৎপাদনের ধারণার সূত্রপাত করে। সামাজিক উৎপাদন বলতে তারা বলেন যে, নিখিলসমাজে মানুষের সামাজিক জীবনও উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ, বাজারে পণ্য উৎপাদন ছাড়াও পরিবারের বিন্যাস ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা, যৌনতার সামাজিক সংগঠনের বিন্যাস রাষ্ট্র ও ধর্মের বিন্যাস রাজনীতি, গণমাধ্যম ও শিক্ষাজগতের বাচন সমাজের প্রচলিত ধারণাগুলিকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেয়। সামাজিক উৎপাদনের এই প্রতিটি বিন্যাসে লিঙ্গবৈষম্যের ভিত্তিতে একদল মানুষ অন্য এক দলের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, প্রত্যেক বিন্যাস অধস্তনদের শ্রমে গড়ে ওঠা সত্ত্বেও তারা ন্যায্য মজুরি ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন এবং প্রত্যেক বিন্যাসের মালিকানা পুরুষের হাতে থাকে। নারীবাদী দর্শন মার্কসীয় দর্শনের তুলনায় আরও বিশদভাবে উৎপাদনের প্রতিটি বিন্যাসে জমে থাকা মালিক-অধস্তনের অন্তরঙ্গ শোষণ-সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে। সামাজিক উৎপাদন ঘটে ক্ষমতা ও শোষণের বহুমাত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে যা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত প্রভু ও শ্রমিকের মধ্যে শ্রেণী, জাতি, লিঙ্গ, শক্তি ও জ্ঞানের উচ্চক্রম গঠন করে। নিখিলসমাজে লিঙ্গবৈষম্যের যে বিন্যাস তৈরি হয় তার বিশ্লেষণ, প্রতিরোধ ও পরিবর্তনই নারীবাদী সমাজতত্ত্বের লক্ষ্য।

নারীবাদী সমাজতত্ত্বে অনুসমাজবিন্যাস (মাইক্রো সোশাল অর্ডার)

অনুসমাজের সামাজিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার স্তরে নারীবাদী সমাজতত্ত্ব জোর দেয় বিষয়কেন্দ্রিক প্রকল্প বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাৎপর্যনির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি একে অপরের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করে তার ওপর। অনুসমাজ বিশ্লেষণের দুটি তত্ত্ব সামাজিক আচরণবাদ ও সামাজিক সংজ্ঞাবাদের থেকে পাঁচটি ক্ষেত্রে নারীবাদী সমাজতত্ত্ব ভিন্নমত পোষণ করে। প্রথমত, মূলস্রোতের অনুসমাজতত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে ব্যক্তির আচরণ সততই উদ্দেশ্যমূলক, অথচ নারীবাদীরা লক্ষ্য করেন নারীর অভিজ্ঞতায় তা সত্য নয়। নারীর দৈনন্দিন জীবনের আচরণ উদ্দেশ্যমূলক নয়, বরং উত্তরসূচক কারণ, তারা নিজের লক্ষ্যপূরণের চাইতে পরিবারের অন্য সদস্যদের চাহিদা অনুসারে কাজ করে। দ্বিতীয়ত, মূলস্রোতের অনুসমাজ বিশ্লেষণে

এমন এক সমাজের ছবি আঁকা হয় যেখানে উদ্দেশ্যমুখী আচরণকারীরা নিরন্তর মুখোমুখি ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে, এবং ধরে নেয় যে ব্যক্তিমাত্রই তাদের ছাঁচের। নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিকরা এমন এক সমাজের বর্ণনা দেন যেখানে নারীরা প্রবল পরিবর্তনশীল ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করে, অথচ কখনই নিজেদের ছাঁচে ফেলে অন্যদের বিচার করেনা। সুতরাং নারীবাদীরা যুক্তি দেন, তাহলে শুধুমাত্র প্রাধান্যবিস্তারি পুরুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সমাজতত্ত্বের ক্রিয়াতত্ত্ব তৈরী হয়েছে, অর্থাৎ তা অসম্পূর্ণ ও একপেশে। তৃতীয়ত, দুই দৃষ্টিকোণে সাম্যের ধারণা আলাদা। প্রথাগত অনুসমাজতত্ত্ব নারীপুরুষের সম্পর্কের অসাম্য স্বীকার করেনা। কিন্তু নারীবাদী অনুসমাজতত্ত্বে দৈনন্দিন আচরণের ক্ষেত্রেও নারীপুরুষের সম্পর্কের চূড়ান্ত বৈষম্য তুলে ধরা হয়। চতুর্থত, দুই মতের সামাজিক আচরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণেও পার্থক্য আছে। মূলস্রোতের চিন্তায় নিখিলসমাজের লিঙ্গধারণার রেশ টেনে অনুসমাজের আচরণের এরূপ ব্যাখ্যা করা হয় যে, আচরণকারী ব্যক্তিরা পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে সামাজিক আচণগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধে এবং শেষে তাদের অভিজ্ঞতার বিষয়ে একধরণের ঐক্যমত্যে পৌঁছয়। কিন্তু নারীবাদীরা আবার মনে করিয়ে দেন যে ঐ ঐক্যমত্য গড়ে ওঠে শুধু পুরুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, নারীর প্রতিদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আচরণকে তুচ্ছ ও অদৃশ্য করে। পঞ্চম মত, মূলস্রোতের সামাজিক সংজ্ঞাবাদী ও সামাজিক আচরণবাদী চিন্তাছাঁচ অনুসমাজে প্রথাগত আচরণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়, ঐ বিন্যাস না মানার স্বাধীনতা যে কেউ নিতে পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মেয়েরা প্রথাগত আচরণছাঁচের বাইরে অন্য কোন ছাঁচ বেছে নিতে চাইলেও তা মূলস্রোতে গ্রাহ্য হয় না। সুতরাং প্রথাগত আচরণছাঁচ মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে স্বেচ্ছামূলক না হয়ে বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। প্রথাগত সমাজতত্ত্ব নিজেদের যথেষ্ট গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী ধরে নিলেও, তার লিঙ্গপক্ষপাত উন্মোচন করে অনুসমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নারীবাদী সমাজতত্ত্ব পথপ্রদর্শক ভূমিকা নিয়েছে।

নারীবাদী সমাজতত্ত্ব আত্মকেন্দ্রিক চিন্তার ছাঁচ (সাবজেকটিভিটি)

নারীবাদী সমাজতত্ত্বের সবচেয়ে জোরালো বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যক্ষবাদের বিষয়কেন্দ্রিক (অবজেকটিভ) বিশ্লেষণকে সম্পূর্ণ বর্জন করে সামাজিক ক্রিয়ার একটি মাত্রা হিসেবে সাবজেকটিভিটি বা আত্মকেন্দ্রিকতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া।

Scanned with CamScanner

তারা মনে করেন বিশেষ করে নারী ও অন্যান্য অধীন বর্গের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও সম্পর্ক বিষয়ে আচরণকারী ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার দিকে মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারণ, প্রচলিত মূলস্রোতের থেকে তাদের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও আচরণ সবসময়েই পৃথক ও প্রান্তিক। প্রথমত, আত্মকেন্দ্রিকতার প্রচলিত তত্ত্বে মিড ও সুলজ মনে করেন যে সামাজিক ভূমিকা পালন করতে করতে আচরণকারী অন্যের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখতে শেখে, যার সঙ্গে আচরণকারীর নিজের দৃষ্টির বিশেষ পার্থক্য থাকে না। কিন্তু নারীবাদীরা দেখান যে, নারীদের সামাজিকীকরণ হয় পুরুষের চোখে নিজেদের দেখতে শেখার মধ্য দিয়ে, তারা পুরুষের দৃষ্টিতে নিজেদের সত্তাকে অন্যসত্তা হিসেবে দেখেন, পুরুষের বিপরীত ভূমিকাকেই নিজেদের বলে গ্রহণ করতে শেখেন। নারীবাদী সমাজতত্ত্ব এর বদলে মেয়েদের আত্মকেন্দ্রিক ভাষ্যের বিশ্লেষণের ওপর জোর দেয়, যা নারীর স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আত্মসচেতনতা গড়ে তোলার সহায়ক হবে।

ডরোথি স্মিথ (১৯২৬) ও অন্যান্য নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিক

'মেলস্ট্রিম' বা মেনস্ট্রিম সমাজতত্ত্বের চিন্তাধারার বিরোধিতা ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে যে নারীবাদী সমাজতত্ত্বের সূত্রপাত হয় তার প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা ডরোথি স্মিথ। তাঁর মতে বিশেষ সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানের সামাজিক নির্মাণ হয়, এবং পুরুষের তৈরি বাচন বা 'মেল ক্রিয়েটেড ডিসকোর্স' নারীর শোষণে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। স্মিথ লক্ষ করেন, প্রচলিত সমাজ-বৈজ্ঞানিক ধারণা ও সমাজ জীবনের প্রকৃত অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেক পার্থক্য। বিশেষত, মেয়েদের জীবনযাপনের বাস্তব অভিজ্ঞতা আর যে পিতৃতান্ত্রিক ছাঁচে তাদের অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করা হয় তার মধ্যে। নিখিলসমাজ যা অনুসমাজের অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রণ করে আর অনুসমাজ কাঠামোর মধ্যে ও ব্যবধান দেখা যায়। তিনি প্রাধান্য-কাঠামো সম্বন্ধে নয়া-মার্কসীয় ও ফেনোমেনোলজিকাল দৃষ্টিকোণের সমন্বয়ে সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনুবিশ্বের বিষয়গত বিশ্লেষণ করেছেন। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের স্বার্থরক্ষাকারী বিশ্লেষণকে একমাত্র বিশ্বায়িত দৃষ্টিকোণ হিসেবে তুলে ধরার বদলে, নিজস্ব অবস্থানে স্থিত ব্যক্তিদের দিনযাপনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি জোর দেন। 'এ সোশিয়োলজি ফর উইমেন' (১৯৭৯) তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই। ফেমিনিস্ট সমাজতত্ত্বের ভিত্তি তৈরি করায় তাঁর অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

পরবর্তী কালে প্যাট্রিশিয়া হিল কলিন্স আরও স্পষ্টভাবে 'শ্বেতাঙ্গ পুরুষের দ্বারা উৎপাদিত জ্ঞানকে জাতিবিদ্বেষী, শ্রেণীবৈষম্যবাদী, লিঙ্গবৈষম্যবাদী প্রাধান্য সৃষ্টিকারী উপাদান' বা 'ম্যাট্রিক্স অফ ডমিনেশন' বলে চিহ্নিত করেন। নারীবাদী বা ফেমিনিস্ট সমাজতত্ত্বের অন্য উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিকেরা হলেন জেসি বার্নাড, ন্যানসি শোডোরো, ক্যারল গিলিগান, সারা হার্ডিং, অ্যাড্রিয়েন রিচ, অড্রে লরডে, প্রমুখ।

উল্লেখ সূত্র

১। মিলেট, কেট, সেক্সুয়াল পলিটিক্স, নিউ ইয়র্ক, ভিরাগো, ১৯৭০, প্রিফেস

২। কাভকা, মিশা, ইন ব্রনফিন এবং কাভকা এড, ফেমিনিস্ট কনসিকোয়েনসেস, থিয়োরি ফর দি নিউ সেনচুরি, নিউ ইয়র্ক, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০১, পৃ. ৯-১১

৩। ব্যারেট, মিশেল, ইন ব্রনফিন এবং কাভকা এড, ফেমিনিস্ট কনসিকোয়েনসেস, ঐ, ২০০১, পৃ-১২

৪। পামেলা অ্যাবোট, ইন্ট্রোডাকশন টু সোশিয়োলজি : ফেমিনিস্ট পারসপেকটিভ, রুটলেজ,

৫। উলফ, জ্যানেট, দি সোশাল প্রোডাকশন অফ আর্ট, লন্ডন, ম্যাকমিলান, ১৯৯৩, পৃ-৮

৬। স্মিথ, ডরোথি, কোটেড ইন, শ্যাফেজ, জ্যানেট, এড, হ্যান্ডবুক অফ দি সোশিওলজি অফ জেনডার, নিউ ইয়র্ক, প্লেনাম পাবলিসার্স, ১৯৯৯, পৃ-১০

৭। কলিন্স, প্যাট্রিশিয়া হিল, কোটেড ইন শ্যাফেজ, ঐ, ১৯৯৯, পৃ-১০

৮। স্টেসি, জুডিথ, ইন ওয়ালেস, রুথ, ফেমিনিজম অ্যান্ড সোশিওলজিকাল থিয়োরি, ক্যালিফোর্নিয়া, সেজ, ১৯৮৯, পৃ-৫২

৯। হাম, ম্যাগি, দি ডিকশনারি অফ ফেমিনিস্ট থিয়োরি, নিউ ইয়র্ক, হারভেস্টার হুইটলিফ, ১৯৮৯

১০। শ্যাফেজ, জ্যানেট, কোটেড ইন ওয়ালেস, ফেমিনিজম অ্যান্ড সোশিওলজিকাল থিয়োরি, ক্যালিফোর্নিয়া, সেজ, ১৯৮৯, পৃ-১০

Scanned with CamScanner